শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য রক্ষা ও বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে

ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনে অর্থনীতিবাদ, সুবিধাবাদ ও বিভিন্ন ধারার সোস্যাল ডেমোক্রেসির চূড়ান্ত অনুপ্রবেশের ফলে পুঁজিবাদী শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা গণআন্দোলন এবং শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। অথচ আন্দোলন গড়ে তুলতে এই ঐক্য অত্যন্ত জরুরি। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সামনে কী কী মূল সমস্যা, বিপ্লবী শ্রমিকদের কী পদ্ধতিতে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, উন্নত রুচি সংস্কৃতির এবং বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতার আধারে কীভাবে ধাপে ধাপে আন্দোলন গড়ে তুলে বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে — এ বিষয়ে ১৯৭৪ সালের এই ভাষণে কমরেড শিবদাস ঘোষ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

কমরেড সভাপতি ও উপস্থিত কমরেডস,

আজকের শ্রমিক কর্মচারীদের এই যে ডেলিগেট সেশন আরম্ভ হয়েছে, তাতে আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা কী সে সম্পর্কে গুটিকয়েক কথা বলে শ্রমিক সংগঠনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপদ্ধতি কী ধারায় হওয়া উচিত এবং এখানেও আপনাদের কাজকর্মের ধারা, রাজনৈতিক প্রচার কী হবে, কী হলে ভাল হয়, আপনাদের কাজের পক্ষেও সুবিধা হয় — সেদিকে দৃষ্টি রেখে আমি আমার বক্তব্য রাখব।

প্রথমত, ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের ইতিহাস। দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব বা তথাকথিত বিপ্লবী বলে পরিচিত নেতৃত্বে বহু বড় বড় শ্রমিক সংগঠন ও সংস্থা এদেশে দীর্ঘদিন থেকে গড়ে উঠেছে। আন্দোলনে জোয়ার-ভাটা আছে, কখনও দু'পা জোর কদমে চলেছে কখনও দু'পা পিছু হটেছে, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্র যা সাধারণভাবে দাঁড়িয়েছে, এতদিনের এত লড়াই-এর পরেও — সেটাই লক্ষণীয় বিষয়। সেই ১৯২০ সাল থেকে ধরুন এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের শুরু কার্যকরীভাবে। এই সময়ের মধ্যে বহু ধর্মঘট হয়েছে। এমন কোনও ইন্ডাস্ট্রি (শিল্প) নেই, ইন্ডাস্ট্রি বলতে আমি শুধু একটা ফ্যাক্ট্রি (কারখানা) বোঝাচ্ছি না, সে ইঞ্জিনিয়ারিং বলুন, স্টিল বলুন, পোর্ট অ্যান্ড ডক (বন্দর বা জাহাজী শিল্প) বলুন, রেলওয়ে বলুন, জেনারেল টেক্সটাইল (বস্ত্র শিল্প), পাট শিল্প বলুন, চিনিকল বলুন, ছোটখাট এমনি ইন্ডাস্ট্রি বলুন — যত ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আছে, সর্বত্রই কমবেশি ইউনিয়ন আছে এবং দীর্ঘদিন ধরে আছে।

এই ইউনিয়নগুলি এমনি এমনি আছে, এমন নয়। ইউনিয়ন আছে মানেই কখনও না কখনও নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে তার লড়ালড়ি আছে, এবং বহু লড়ালড়ি হয়েছেও। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতভেদ সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, যা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিধির মধ্যে পড়ে — মজুরকে তাদের উপর যে অন্যায় অত্যাচার হয় তার বিরুদ্ধে বা তাদের যে সমস্ত ন্যায্য দাবি-দাওয়া আছে তা নিয়ে লড়বার জন্য গড়ে তুলতে হয়। এই দাবিগুলো বিনা লড়াইতে এই শোষণমূলক ব্যবস্থায় পূরণ হয় না। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিক বা ম্যানেজমেন্টের হাত থেকে কিছু পাওয়ার উপায় হিসাবে মজুরদের নিজেদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া কোনও উপায় নেই। কারণ মজুররা অসংগঠিত থাকলে, মালিক এমনকী নিজেদের তৈরি আইন-কানুনগুলোকে পর্যন্ত নিজেরা মেনে চলে না, এটা আপনারা সকলেই জানেন। অথচ এই যে মজুরদের ইউনিয়ন, যা দিয়ে আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলি, তার একটা ঐক্য পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে রাখা যায়নি। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর দিকে চেয়ে দেখুন। কতগুলো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পর্যন্ত, দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ বিভক্ত হয়ে দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত, গোটা দেশে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ছিল এ আই টি ইউ সি। বিভেদপন্থার জন্য ১৯৩০ সাল নাগাদ একবার তাতে ফাটল ধরেছিল। ১৯৩০-৩১ সাল নাগাদ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এ আই টি ইউ সি-তে এই ভাঙন কার্যকর হয়। এম এন রায়ের দল একসময় ফেডারেশন অব লেবার নামে একটা স্বতন্ত্র

সংস্থা খাড়া করেছিল। কিন্তু সেটার এমন কিছু প্রভাব বা কার্যকারিতা ছিল না। তাহলে এ আই টি ইউ সি-কে ধরুন, সেখানে ১৯৩০ সাল নাগাদ উগ্রবামপন্থী রাজনীতির বিভ্রান্তির জন্য এই বিভেদ এসেছিল এবং রেড ট্রেড ইউনিয়ন নামে নতুন একটা সংস্থা রণদিভেরা গড়েছিলেন।

বারবার চেষ্টা হয়েছে শ্রমিক ঐক্যের, সকলেই বলেছে ঐক্য চাই। আর যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি নিজে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, কার্যকারিতার দিক থেকে উপলব্ধি করি যে, রাজনৈতিক মতবাদিক সংঘর্ষ যাই থাকুক, উচিত অর্থে অর্থাৎ যা হওয়া উচিত, যেটা মডেল হতে পারত, সেই দৃষ্টিতে দেখলে মজুরদের ডেমোক্রেটিক ব্যাটল-এর (গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের) প্ল্যাটফর্ম বা ফোরাম (মোর্চা বা সংস্থা) একটাই থাকা উচিত এবং এদিকে সবাই সচেষ্ট হলে ভালই হত। আমার কথা হল, লেট দ্য পলিটিক্যাল পার্টিজ উইন ওভার দ্য ওয়ার্কার্স, রাজনৈতিক দলগুলি শ্রমিকদের তাদের স্বমতে বুঝিয়ে জয় করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক। তবে এই স্বমতে নিয়ে যেতে হবে, জোর করে নয়, নিজের কথাগুলি জবরদস্তি মানিয়ে নেওয়ার জন্য নয়, কমিটিগুলিকে 'ক্লিক' করে বা জবরদস্তির পদ্ধতিতে দখল করে নয়। আমি বলি রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করে, মজুরশ্রেণীকে সপক্ষে টেনে এনে, আদর্শের জোরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে যদি কোনও পার্টি কোনও ইউনিয়ন কন্ট্রোল করতে পারে তো করুক। সেখানে আমি কেন লোককে বুঝিয়ে আমার পক্ষে আনতে পারলাম না, তার জন্য রাগারাগি করে আমি আলাদা করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারি না, অথচ এই পদ্ধতিতে বারবার বিভেদ হয়েছে এবং হচ্ছেও। আমার কথা, আমার সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আমার রাজনীতি, আমার কর্তৃত্ব আমি অপরের উপর চাপিয়ে দেব, এ হল জবরদস্তির পদ্ধতি। এ চলতে পারে না।

কমরেডস, এটা একটা গুরুতর সমস্যা। শ্রমিক আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দেয় সেই রাজনৈতিক দলগুলোর চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গতকালই (প্রকাশ্য সম্মেলনের ভাষণে) আমি একবার বলেছি, এই যে শ্রমিক আন্দোলনে বারবার ফাটল ধরেছে, ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে, আই ডোন্ট ফাইন্ড এনি রিজন্, কোনও সঙ্গত কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। রাজনৈতিক মতবাদে পার্থক্য আছে বলে, শ্রমিকদের দৈনন্দিন আন্দোলনের যেটা হাতিয়ার, যেটা গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের যুক্ত মোর্চা, ডেমোক্রেটিক ব্যাটল-এর যেটা হল ইনস্ট্রুমেন্ট, হাতিয়ার বা ফোরাম তাতে বিভেদ আনার কোনও কারণ আছে কি? আমি মনে করি দেয়ার ইজ নো আর্থলি রিজন ফর ইট, এর কোনও সঙ্গত কারণ নেই। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জন্য ডেমোক্রেটিক ফোরামে, প্ল্যাটফর্মে বিভেদ আনার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। দলের নেতৃত্ব অর্থাৎ বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এটা অপরিহার্য নয়। যারা বলে অপরিহার্য তারা বিপ্লব কোনও দেশেই করেনি বরং তারা সব দেশে বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে, ফ্যাকশনালিজম (গোষ্ঠীচক্র গড়ার কাজ) করেছে, মজুরদের মধ্যে বিভ্রান্তি এনেছে। বিপ্লব যারা করেছে তারা সর্বযুগে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধ মোর্চা যেটা হবে সেখানে ঐকমত্যের ন্যূনতম কর্মসূচির উপর সর্বোচ্চ পরিমাণে জনগণের ঐক্য রাখা যায় কি না। ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (গণতান্ত্রিক আন্দোলন) হল একটা জায়গা যেখানে এগ্রিড মিনিমাম প্রোগ্রাম (ঐকমত্যের ন্যূনতম কর্মসূচি) অতি সহজেই গড়ে তোলা যায়। তাদের মতে যেগুলো ন্যায্য দাবি, জনগণের তরফ থেকে যে ন্যায্য দাবিগুলো তোলা দরকার, তা নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে একটু-আধটু মতপার্থক্য থাকলেও এই মতপার্থক্য খুব একটা ফান্ডামেন্টাল নেচারের (মৌলিক চরিত্রের) হয় না। এক্ষেত্রে ঐক্য গঠনের কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। একটা কমন এগ্রিড প্রোগ্রাম, একটা চার্টার অব ডিমান্ডস (দাবি সনদ), বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী দলগুলি, মোটামুটিভাবে সব দলগুলির মধ্যে না হলেও, বেশিরভাগ দলগুলির মধ্যেই হওয়া সম্ভব। তাহলে ঐক্য হবে না কেন? এই ঐক্য বজায় রাখতেই বা পারব না কেন? বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে সংগঠন খাড়া করতে হবে, এই জন্য কি? না, তার জন্য বিভেদ আনার দরকার নেই। বরঞ্চ এর জন্য ঐক্য দরকার। যত মজুরকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারব, তত অবিপ্লবী বা অ-শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলোর পক্ষে আলাদা আলাদা প্ল্যাটফর্ম থাকার ফলে মজুরদের মধ্যে বিভ্রান্তি প্রচারের যে সুযোগ থাকে, তা আর থাকবে না।

একসঙ্গে কাজ করলে, মজুররা বিভিন্ন দলের নেতৃত্বের পরিকল্পনা, চিন্তাভাবনা, লড়াই পরিচালনা করার কায়দা, কর্মী-নেতাদের আচরণ, রুচি, অভ্যাস, সংস্কৃতি, চরিত্র — এই সবগুলোই এক সঙ্গে পাশাপাশি রেখে বিচারের সুযোগ পায়। এর ফলে মজুর সংগঠনের উপর বিপ্লবী নেতৃত্ব আরও তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়, সহজ হয়। কাজেই কোনও সত্যিকারের বিপ্লবী দলই, বিপ্লবী নেতৃত্বে মজুর সংগঠনকে আনতে হবে বলে শ্রমিক আন্দোলনের ডেমোক্রেটিক প্ল্যাটফর্ম, ফোরাম বা ইউনিয়নে বিভেদ আনতে চায় না। আমরাও

তাই এর পক্ষপাতী নই। তাহলে এ জিনিস ঘটছে কেন? অনেকেই হয়ত এ প্রশ্নটি করবেন। এটা জানতে হলে বুঝতে হবে এটা ঘটে কেন? কেউ স্বীকার করুন আর নাই করুন, যে কারণে এটি বারবার ঘটেছে তার কারণ হল দুটো, যা আমরা আগে বলেছি।

নিজেদের বিপ্লবী দল বলে মনে করে এমন একটি দল মনে করছে, সরাসরি তার নেতৃত্বে সংগঠন না হলে যারা প্রতিক্রিয়াশীল তাদের নেতৃত্ব সংগঠনের উপর কায়েম হবে। তারা সংগঠনে থাকলে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে কোনও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন খাড়া করা যাবে না। হয় এই সঙ্কীর্ণ ধারণার বশবর্তী হয়ে উগ্রতা থেকে আলাদা সংগঠন হয়েছে, যেমন '৩০ সালে হয়েছিল একবার। এ কাজ করেছিল আমাদের দেশের বর্তমানে মূলত তিনভাগে বিভক্ত এই কমিউনিস্ট নামধারী দলটি। বি টি রণদিভের নেতৃত্বে তারা রেড ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে এ আই টি ইউ সি-র মধ্যকার ঐক্য ভেঙেছিল। আর না হয়, যে পার্টি কোনও কারণে একটা সময় ইউনিয়নের নেতৃত্বে এসে অপরের কোনও বক্তব্য উপস্থাপনা করার সুযোগই দেয় না, যে ক্লিক (ষড়যন্ত্রমূলক কাজ) করে, কোটারি (চক্র তৈরি) করে, জবরদস্তি করে, নিজের মতামতকে জোর করে চাপিয়ে দেয়, সেই পার্টি তার ফ্যাসিস্ট সুলভ আচরণের দ্বারা ঐক্য ভাঙে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে, একত্রে অপরের সঙ্গে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আদর্শগত সংগ্রাম চালাবার সাথে সাথে কীভাবে ঐক্য বজায় রাখতে হয়, ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে হয়, এ অভ্যাস তার আয়ত্তে নেই। এই ধরনের পার্টিগুলি একবার যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখল করলেই, ইউনিয়নের কর্তৃত্ব দখল করলেই, অন্যকে জবরদস্তি পদদলিত করে। এটাও পেটিবুর্জোয়া অবিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

বিপ্লবী হলে এইসব দল বুঝত, সংগঠনে ঐক্য রাখার প্রয়োজন তারই সবচেয়ে বেশি। যত মজুরদের মধ্যে ঐক্য রাখা যায় এবং একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে মজুরদের সংগঠন করা যায় তত মজুরদের আন্দোলন যেমন জোরদার হয়, তেমনি মজুরদের পক্ষেও বিভিন্ন পার্টিগুলোকে বিচার করে নেওয়ার, পার্টিগুলোর অভিমত ও মতাদর্শগুলি, আন্দোলন পরিচালনার কায়দা ও কৌশলগুলি বিচার করে নেওয়ার, বিভিন্ন দলের নেতাদের কর্মীদের চরিত্রগুলো দেখে, শুধু তাদের মুখের কথা শুনে নয়, তাদের আচার-আচরণ, অভ্যাস, কীভাবে তারা কাজকর্ম চালায়, এই সমস্ত দেখে তাদের বিচার করে নেওয়ার সুযোগ বেশি হয়। তাই বিপ্লবী দল কখনও গণআন্দোলনের ঐক্য ভাঙতে চাইবে না। ঐক্য রাখতে চাইবে, পারুক আর নাই পারুক। কারণ রাখবার ইচ্ছা করলেই, সবসময় সে ঐক্য রক্ষা করতে নাও পারে, শুধু তার ইচ্ছার উপর সবকিছু নির্ভর করে না। বহু শক্তি এবং পরিবেশ, যেগুলো তার বিরুদ্ধে কাজ করছে, যে সমস্ত ঐক্যবিরোধী শক্তি কাজ করছে, শক্তির ভারসাম্যের দিক থেকে তাদের যদি ক্ষমতা বেশি হয়, আর সেই ক্ষমতাটা যদি ঐক্য গড়ার পক্ষে না গিয়ে ঐক্য ভাঙার পক্ষে যায়, তাহলে বিপ্লবীদের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে ঐক্য রাখা যায় না — যেমন, ইতিহাসে বারবার ঐক্য ভেঙেছে, ভাঙা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্বকারী দলগুলির এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই শ্রমিকদের ঐক্য রাখা যায়নি, বার বার বিভেদ এসেছে — রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্য এই বিভেদ আসেনি।

মজুর আন্দোলনে এই যে বার বার বিভেদ এসেছে, একে যে রোখা যায়নি তা এই কারণে যে, সত্যিকারের বিপ্লবী দল, একমাত্র যে দল ঐক্য রাখার প্রয়োজনীয়তা বোঝে সেই দলটি যথেষ্ট শক্তিশালী ও ক্ষমতাসম্পন্নভাবে দেশে মজুর বা গণআন্দোলনের নেতৃত্বে আজও অনুপস্থিত। উপযুক্ত ক্ষমতা ও শক্তি থাকলে তবেই একমাত্র বিপ্লবী দল পারে অপর সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে। যে দলটি ঐক্য রাখার যথার্থ বাস্তব প্রক্রিয়াটি জানে সেই বিপ্লবী দল আজও তেমন শক্তির অধিকারী হয়নি। অন্যদিকে যে দল মুখে ঐক্য রাখার কথা বলে কিন্তু নিজেই একটি ঐক্য বিনষ্টকারী শক্তি, সেই দলের ক্ষমতা আজও বেশি। ক্ষমতা বেশি হলেই এরা অপরকে জোর করে আটকায় অথবা এরা ভাবে, আমি যখন বিপ্লবী তখন অবিপ্লবীদের সঙ্গে পাশাপাশি বসলেই আমার বিপ্লবী চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে, আমার পবিত্র ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে। এরা আসলে বিপ্লবীই নয়, বিপ্লবের নামে বিপ্লবের কথা বলে এরা ট্রুইজম-এর (নৈষ্ঠিক গোঁড়ামির) চর্চা করে। তাই বলছিলাম এই সমস্ত পার্টিগুলোর জন্য, এই সমস্ত ট্রেন্ডগুলোর (ঝোঁক) জন্য বারবার বিপ্লবী আন্দোলনে, মজুর আন্দোলনে বিভেদ এসেছে। তাহলে আপনাদের কী করতে হবে?

প্রথম কথা হচ্ছে, আপনাদের এখানেও যে ভাগ হয়েছে, যে বিভেদ এসেছে, যতটুকু আপনাদের দলিল পড়ে জানলাম বা আমি নিজেও যা জানি, তা এই একই কারণে হয়েছে। একসময় যুক্ত ইউনিয়ন গড়ে ওঠার

আগে, প্রথমে যখন আমরা একটা ইউনিয়ন আলাদাভাবে গড়ে তুলি, তার থেকেই দুর্গাপুরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে খুব ডিটেলসে না হলেও কিছু কিছু আমি জানি। তাই এ সম্পর্কে আমি যতটুকু ওয়াকিবহাল তাতে ঐক্য ভাঙার কারণ হিসাবে কেউ যদি বলেন যে, আমাদের তরফ থেকে অর্থাৎ একটা বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, ধরুন সোজা কথায়, এস ইউ সি আই-এর যারা সমর্থক এবং কর্মকর্তা, তাঁদের জন্যই এই ঐক্য ভেঙেছে, তা আমি মানতে পারি না। মানতে পারি না এই জন্য যে এটা সত্য নয়। সত্য হলে এটা নিশ্চয়ই বিচার্য বিষয় এবং তাঁদেরকে চেপে ধরার প্রশ্ন — তাঁরা কেন এবং কোন বিপ্লবের স্বার্থে আলাদা ইউনিয়ন করেছেন? তার দ্বারা কী কাজ হবে? তাঁরা তো জানেন যে, এর দ্বারা শ্রমিকদের লড়াই করার শক্তি বিভক্ত হবে, শ্রমিকদের একসাথে লড়ে এবং লড়াইয়ের ময়দানে একসাথে সমস্ত দলগুলোকে সহজভাবে বিচার করে নেওয়ার যে সুযোগ ছিল সেই সুযোগ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হবে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা প্ল্যাটফর্ম থেকে শ্রমিকরা যার যার নেতার বক্তৃতা শুনবেন এবং বক্তৃতা শুনে যার যার নেতাকে তারিফ করতে থাকবেন। এর দ্বারা শ্রমিকদের বিভ্রান্তি কাটাতে সহায়তা করা হয় না। শুধু বাইরের প্রচারের দ্বারা অপর দলের ভুল রাজনীতিকে পরিষ্কার করে এক্সপোজ করা যায় না বা মিথ্যা জিনিসটাকে ধরিয়ে দেওয়া যায় না। মিথ্যা — তা মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে, সত্যরূপে কাজ করে, সত্যরূপে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। না করলে, নাৎসিরা এবং হিটলারের মতো একজন জঘন্য ফ্যাসিস্ট নেতা সমস্ত যুবসম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করল কী করে? হিটলারের নাৎসিবাদ কি সত্যকে প্রতিফলিত করেছিল? না, এটা মানবতার জঘন্যতম শত্রু, অনিষ্টকারী একটা দর্শন বা রাজনৈতিক তত্ত্ব ছিল? তা সত্ত্বেও জার্মানির শুধু আনকোরা যুবকরা নয়, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, ইনটেলেকচুয়ালরা পর্যন্ত একটা সময় এর দ্বারা বিরাটভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিল। তাহলে সাময়িকভাবে হলেও মিথ্যা কি জয়যুক্ত হয় না? এ তো অবাস্তব কথা নয়। কেননা শুধু প্রচার করে ধরিয়ে দিলেই মানুষ সত্য জিনিসটা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারে — ব্যাপারটা এত সহজ নয়। সত্য মিথ্যার মধ্যে ইন বিটুইন দ্য লাইনস (কথায় বা প্রকাশের মারপ্যাঁচ বা ফাঁকটুকু) বিষয় বুঝতে পারা অত্যন্ত কঠিন। তাই যুক্ত মোর্চায় পরস্পরকে পাশাপাশি দেখে বিচার করে নেওয়ার সুযোগটা, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের একটা প্রধান শর্ত। আমরা যখন ঐক্যের কথা বলি তখন তো আমরা সংগ্রামবিহীন ঐক্যের কথা বলি না। ঐক্যের মধ্যে নিরন্তর আদর্শগত সংগ্রাম রয়েছে, ঐক্যের মধ্যে মতপার্থক্যও রয়েছে। তাই আমরা যখন ঐক্যের কথা বলি তখন আমরা সংগ্রামের কথাও বলি। আমরা যখন অপরের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলি তখন আমরা ঐক্যের জন্যও চেষ্টা করি। এ যদি আমরা না করি তাহলে সংগ্রামটা ইউজলেস (নিরর্থক), সংগ্রামের কোনও মানে নেই। এই কথাটা আপনাদের ভাল করে বুঝতে হবে।

একটি দল আপনাদের কথা বলতে দেয়নি, মুখ খুলতে দেয়নি, বিরুদ্ধ মত হলেই, নেতাদের সমালোচনা হলেই গায়ের জোরের রাজনীতি করেছে। এর মানে আমি একথা বলি না যে অন্য পার্টির প্রভাব বাড়ছে দেখলে, নিজেদের কর্তৃত্ব কমছে দেখলে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে লড়বেন না বা অপরের মত ভুল প্রমাণের চেষ্টা করবেন না এবং মজুরের কাছে তা হাস্যকর বলে দেখাবার চেষ্টা করবেন না। তা তাঁরা করুন, রাজনৈতিক আদর্শগত লড়াই পরিচালনা করে মজুরদের তাঁরা টেনে নিন, এতে কেউ আপত্তি করতে পারে না। কিন্তু তা না হয়ে বাস্তবে যা হয়েছে, তা হচ্ছে কোনও বিরুদ্ধ মতকে কথা বলতে দেব না। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে হোক, স্ল্যান্ডার (কুৎসা রটনা) করে হোক, ক্যারেকটার অ্যাসাসিনেশন (চরিত্র হনন) করে হোক, জবরদস্তি ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট (দৈহিক আক্রমণ) করে হোক, আমি তাকে মাথা তুলতে দেব না। এই মনোভাবের ফলে বাধ্য হয়েই যদি আপনাদের আলাদা ইউনিয়ন গড়তে হয়, ঐক্য যদি ভেঙে থাকে, তবে ঐক্য ভেঙেছে বলেই আমাদের আলাদা করে শুধু লড়ে যেতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে শুধু আমরা সমালোচনা করে যাব, ক্রিটিসিজম করে যাব, আদর্শগত আন্দোলন করে যাব এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের এক্সপোজই করব, আর কিছু করব না, এ দৃষ্টিভঙ্গি ও কিন্তু ভুল। এটা আপনাদের করতে হবে ঠিকই। তবে এর মধ্য দিয়ে আপনারা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথাটা এবং ঐক্যের পথে বাধাগুলি কী কী তা যদি মানুষের সামনে বার বার তুলে না ধরেন এবং নিজেদের দিক থেকে নিঃশর্তভাবে এই ঘোষণাটি না রাখেন যে, অনৈক্যের পথে যে কারণগুলি কাজ করছে তা এলিমিনেটেড (অপসারিত) হলে আপনারা শুধু ঐক্যবদ্ধ হবেন তাই নয়, সেই ঐক্যকে রক্ষাও করবেন — নিজেদের দিক থেকে নিঃশর্তভাবে এই ঘোষণাটি যদি না রাখেন, তাহলে মস্ত ভুল হবে। যে কারণগুলি ঐক্য ভাঙছে মজুরের সামনে তা নিয়ত তুলে ধরে আপনারা তো এই কথাটা তাদের বলবেন,

তোমরা মজুররা উদ্যোগ নিয়ে ঐক্যের পথে এই কাঁটাগুলি দূর কর। ইউনিয়নের নেতৃত্বে যে দল আছে তার যদি ক্ষমতা থাকে, তার যদি মেজরিটি সাপোর্ট থাকে, সে-ই নেতৃত্ব দেবে। সেটা কোনও প্রশ্ন নয়। আমার ক্ষমতা নেই, আমি তার জন্য রাগারাগি করব কেন? আমি মজুরদের ভোট পাইনি তার জন্য আমি রাগারাগি করব কেন? কিন্তু আমি যদি একটা সলিটারি ভয়েস, একক কণ্ঠও হই, আমার মতটা আমাকে বলবার সুযোগ দিতে হবে — এটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ঐক্য রক্ষার একটা প্রধান শর্ত। এটা না করলে যে একক শক্তি সে তো একক বলেই অন্যের আনুগত্যে থাকতে পারে না। সে কীসের জন্য থাকবে? তাহলে তাকে ফ্যাক্শনাল ওয়ার্ক করতে হয়, আর তা নাহলে ক্লিক করতে হয়। সে তো আলাদা জিনিস। এগুলি তো বিপরীত দিক থেকে ঐক্য ভাঙার প্রক্রিয়াকেই বাড়াতে সাহায্য করবে।

এটা অন্য জিনিস। অনেক সময়, শত্রুশিবিরকে ভাঙার জন্য বিপ্লবীদের একাজ করতে হয়। কিন্তু এখানে তো আমি মজুর আন্দোলনে আছি, এটাকে তো আমি শত্রুশিবির হিসাবে ভাবছি না। যেখানে ঐক্য গড়তে পারিনি, অপরের একটা ইউনিয়ন যেটা প্রতিক্রিয়াশীলদের নেতৃত্বে চলছে, তার থেকে মজুরদের মুক্ত করাই যেখানে প্রশ্ন এবং সেখানে যদি বাধ্য হয়েই আমাকে কাজ করতে হয়, তখনই তো আমার ফ্যাকশনাল ওয়ার্ক করার কথা ওঠে। কিন্তু যেখানে আমি মজুরদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা ভাবছি, সেখানে আমাকে বলতে দেওয়া হোক আর নাই হোক সেখানে ফ্যাকশনাল ওয়ার্ক-এর কথা আসে কোথা থেকে? ঐক্যের সঙ্গে তো ফ্যাকশনাল ওয়ার্ক-এর কোন সম্বন্ধই নেই। তা যদি হয়, এখানে আমার কাজ করার সুযোগ থাকবে না কেন? ইভ্ন ইফ আই অ্যাম এ লোন ম্যান, আই মাস্ট হ্যাভ দ্য রাইট টু স্পিক, আমি যদি একাও হই তবু বক্তব্য রাখার অধিকার আমার আছে ও থাকবে। আমার যদি ক্ষমতা না থাকে, মজুররা যদি আমাকে সমর্থন না করে, আমার কথা শোনার পরও আমাকে সমর্থন না করে, অন্যকে করে — সে নেতৃত্ব দেবে। আমি সেই নেতৃত্বের অধীনেই এগ্রিড কমন প্রোগ্রাম-কে সমর্থন করব। কিন্তু সাথে সাথে আমার কোথায় বিরোধিতা, কোথায় অসুবিধা, কোথায় আমার মতপার্থক্য — সেগুলোও বলব। এই বলার অধিকার আমাকে দিতে হবে। এই মানসিকতা যদি বজায় থাকে, তাহলে অন্তত লেফটিস্ট পার্টি, মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট বলে যারা নিজেদের দাবি করে তাদের আলাদা আলাদা শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ইউনিয়ন বা ফোরাম থাকার কোনও কার্যকারিতা আমি দেখতে পাই না। বরং এটা ক্ষতিকারক। তাই বাধ্য হয়ে আলাদা ইউনিয়ন করতে হলেও, ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার এই দিকগুলি, ঐক্যের এই স্লোগানটি আপনাদের তুলে ধরতে হবে। এটা কোনও ট্যাকটিক্স নয়, ম্যানুভার-এর (সুচতুর পরিকল্পনার) বিষয়ও নয়, লোক ঠকানো একটা প্রোপাগান্ডাও নয় — এটা সত্যিই আপনারা চান। কারণ এটি যদি মজুরদের বুঝিয়ে শেষপর্যন্ত আপনারা আনতে না পারেন তাহলে আপনাদের অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর হবে। আপনারা কর্মী পাওয়ার দিক থেকে, আদর্শগত দিক থেকে হয়ত এগোবেন কিন্তু সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতির দিক থেকে এবং বিপ্লবী নেতৃত্ব বলতে যেটা আপনারা বোঝেন, শ্রমিক আন্দোলনে সেই বিপ্লবী নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে, সময় আপনাদের লাগবে অনেক বেশি, বাধার সম্মুখীন হতে হবে আপনাদের অনেক বেশি।

বিপ্লবী কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণবিধি সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়

তাহলে যুক্ত আন্দোলনের মধ্যে ঐক্যবিরোধী দু'টি মূল ইনগ্রেডিয়েন্টস (উপাদান) — একটা জবরদস্তি আর একটা সেকটেরিয়ান অ্যাটিচিউড (সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি)। এছাড়া আরও একটি বিষয় সম্পর্কে আমি বলতে চাই। তা হল বিপ্লবীর স্পর্শকাতরতা। অনেকে মনে করেন, অবিপ্লবীর সঙ্গে বসলেই, একসঙ্গে কাজ করলেই যেন বিপ্লবী চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে মার্কসবাদীরা, বিশেষ করে কমরেড লেনিন বার বার অনেক হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি এক সময় বলেছেন — বিপ্লবের প্রয়োজনে, বিপ্লবের প্রক্রিয়াতে যে ঐক্যের প্রয়োজন গড়ে উঠেছে, তাকে লক্ষ না করে, যারা অনেক সময় শত্রুর সঙ্গে, দুশমনের সঙ্গে এবং অবিপ্লবীর সঙ্গে প্রয়োজনেও একত্রে কাজ করতে পারে না, তারা আসলে নিজেদের ছায়া দেখে পালায়। তাদের নিজেদের মধ্যেই যে ভূত, তা দেখেই তারা ভয় পায়। আসলে তাদের নিজেদের চরিত্রে দৃঢ়তা নেই। তারা কোনও বিপ্লবীই নয়। তাদের জানতে হবে, হাউ টু ওয়ার্ক উইথ অল, ইভেন উইথ ডিফিকাল্ট পিপ্ল — কীভাবে সবার সাথেই কাজ করা যায়, এমনকী গোলমেলে লোকের সঙ্গেও কাজ করা যায়। বিপ্লবীরা সবার সঙ্গেই

কাজ করতে পারে, তাদের সে ক্ষমতা এবং চরিত্রের ভিত্তি থাকা উচিত। তবে সবার সঙ্গে কাজ করতে পারার ইচ্ছা বা ক্ষমতা আছে মানে এই নয় যে, সবার সঙ্গে কাজ করা যাবে। সবার সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারটা নির্ভর করে অনেকগুলি ফ্যাকটর-এর উপর। ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঐক্য যে বার বার ভেঙেছে তার মূল কারণ হচ্ছে এইগুলো।

অনেকে বলেন যে, যেহেতু স্বাধীনতার পর শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হয়েছে, তাই পার্টি পার্টি সব আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন করেছে। শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হওয়ার সাথে আলাদা আলাদা পার্টির আলাদা আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন করার কী সম্পর্ক আছে? স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিভিন্ন দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এবং সংগ্রামের যে রূপ ছিল, আজ শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের তীব্রতা আরও বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, দলগুলির পরস্পরের রাজনৈতিক মতাদর্শের সংগ্রাম আরও বেশি তীব্র আকার ধারণ করার কথা। কিন্তু তা হয়নি, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সাধারণ মোর্চায় চিড় খেয়েছে। খেয়েছে এই দু'টি জিনিসের জন্য — সেকটেরিয়ান আউটলুক এবং জবরদস্তি, অপরকে ফাংশন করতে, কাজ করতে দেব না এই মনোভাবের জন্য।

সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির কথাগুলি মুখে বলব কিন্তু কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংখ্যালঘিষ্ঠকে পদানত করে রাখব, সংখ্যাধিক্যের জোর খাটিয়ে অন্যকে নিজের রাজনীতির অনুকূলে নিয়ে আসব। আমি যা বলব গোলামির মনোভাব নিয়ে নির্বিচারে তা মেনে নিলে দরকার হলে তাকে নেতা-টেতা করে দিতেও আমার আপত্তি নেই। অনেকেই এসব করে। আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা বলি, অনেক বড় মানুষের কথা বলি, কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে যারা আমরা নিজেদের দাবি করি তারা হিউম্যানিস্টদের (মানবতাবাদীদের) যে মূল্যবোধ, তা পর্যন্ত মেনে চলি না। আপনারা মনে রাখবেন, চাটুকারদের যে পছন্দ করে এবং প্রশ্রয় দেয়, সে নিজেও আসলে নোংরা লোক। কোনও বড় মানুষ জেনে বুঝে নিম্ন মানসিকতার শিকার হয় না; যে চাটুকার, পদলেহী অর্থাৎ যারা তোয়াজ করে, ফ্ল্যাটারি করে — তাদের সে পছন্দ করে না। তোয়াজ করছে বলেই তাদের নেতা করে দেয় না। মানুষের মধ্যে তাদের সম্পর্কে কোনও মোহ সৃষ্টিতে সাহায্য করে না। কেননা, নেতা কথাটার একটা মানে আছে। নেতা একটা মডেল। নেতা জনগণের মধ্যে সমাজবিপ্লবের পরিপূরক রুচি, ন্যায়নীতির ধারণা ও আদর্শকে প্রতিফলিত করে। সেইজন্য একটি লোক যেহেতু তেল দিয়ে নাম করতে চায়, তাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমি নেতা করে দিতে পারি না, ট্যাকটিক্স-এর অর্থেও এটা করা যায় কি? তাহলে আমি কত বড় সর্বনাশ করলাম। মানুষের সামনে একটা বুটলিকার-কে, চাটুকারকে নেতৃত্বের মডেল হিসাবে উপস্থিত করলাম, যে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য যে কোনও মানুষকে তেল দিতে পারে। অথচ অনেক তথাকথিত মার্কসবাদী নেতারাই আকছার এ জিনিস করছেন। এখানে কারোর নাম-টাম আমি করতে চাই না। তাঁরা কোনও বিপ্লবের প্রয়োজনে এটা করছেন না। যেহেতু কিছু লোক তাঁদের তেল দেয়, তাই তাঁরা সেই লোকগুলিকে প্ল্যাটফর্ম দেন। একবারও তাঁরা ভেবে দেখেন না যে, এই লোকগুলি নেতা হলে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কৃতি, তাদের আদর্শবাদ কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছাবে।

শুধু স্লোগান দিয়ে কোনও দেশে বিপ্লব হয়নি। বিপ্লবের জন্য মানুষের একটা সুস্থ এবং সুষ্ঠু নৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন আছে। মানুষগুলো যদি স্লোগান-মঙ্গার (স্লোগান সর্বস্ব) হয়, দলবদ্ধ থাকলে সাহসী, দলবদ্ধ না থাকলে যদি কুঁকড়ে যায়, কুকুর-বেড়ালের মতো লাঠি দেখলেই পালায় আবার নিজের হাতে লাঠি থাকলে মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে না, তাদের উপর হামলা করে, তাহলে এই মানুষগুলোর দ্বারা বিপ্লব হয় নাকি? এই যে ব্লাডি ম্যানিয়াক (রক্তলোলুপতার) প্রবণতা, এতো বিপ্লবের বিরুদ্ধ শক্তি। এর দ্বারা সমাজ পরিবেশের মধ্যে ফ্যাসিস্ট মানসিকতা তৈরি হয়। মজুর আন্দোলনে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে আজ এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর আচরণ চলছে। শুধু বাইরের লোকের বিরুদ্ধে নয়, দলের অভ্যন্তরে, দলের বাইরে, যা কিছু ফিল্‌দি (নোংরা), যা মানুষকে বড় করতে, মহৎ করতে সাহায্য করে না, তার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম হওয়া উচিত এবং এই সংগ্রাম শুধু বাইরের লোকের বিরুদ্ধেই নয়, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও।

নেতা হওয়ার প্রয়োজনটা কোথায়? নেতা একটি প্রয়োজনীয় ইনগ্রেডিয়েন্ট, যে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। তাই আপনাদের আন্দোলনে আপনারা যত বেশি সংখ্যক নেতা তৈরি করতে পারবেন, আপনাদের কাজের অগ্রগতি তত দ্রুত হবে। কিন্তু দেখা গেল, নেতৃত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই নেতা কতকগুলি ভাইসেস-

এর শিকার বনে গেল, নানা রকম ব্যক্তিবাদের শিকার, পপুলার জেসচার-এর শিকার বনে গেল। এই কথাগুলির মানে আপনাদের বুঝতে হবে। পপুলিজম মানে এমন সব আচরণ যা করলে সহজে নাম করা যায়। ঢং, চলাফেরা, ওঠা-বসা, কথা বলা, ঢিলে-ঢালা কায়দা প্রভৃতি সবকিছুর মধ্য দিয়ে সে সাধারণ লোকের কাছ থেকে সহজে প্রশংসা আদায় করে। এগুলোর দ্বারা সে কী করে? সে যেমন তার নিজের ক্ষতি করে, তেমনি আন্দোলনের মধ্যে নেতার যে কাজটি করা দরকার, ঠিক তার বিরুদ্ধ জিনিসটি করে। অর্থাৎ লোকে যদি তার সংস্পর্শে আকৃষ্ট হয়, তাহলে তা ভুল ভাবে হয়। সাধারণভাবে সমাজ পরিবেশের যে নিম্ন মানসিকতা ও রুচির শিকার বনে যায় জনতা, তার সঙ্গে নেতার আচরণ, চলাফেরার মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও একটা মিল খুঁজে পায় বলে তারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে জনতার মধ্যেও ঢিলে-ঢালা ভাব আসে। তাদের নেতাদের তারিফ করাটাও হয় বাজে ধরনের। তার ফলে এইসব নেতার সংস্পর্শে থাকার মধ্য দিয়ে জনতার রাজনৈতিক চেতনার মান ওঠার বদলে আরও নিচের দিকে নামতে থাকে।

ফলে, নেতা আমাদের চাই, কিন্তু এমন নেতা চাই, যে নেতার মতো আচরণ করে, যার দায়িত্ববোধ আছে, যে যেকোনও অবস্থায় নিজেকে সামাল দিতে পারে এবং অপরকে পথ দেখাতে পারে। যে নিজের আচরণের দ্বারা অন্যকে এই শিক্ষা দেয় যে, অসুবিধা হলেও, এমব্যারাসিং সিচুয়েশন (অস্বস্তিকর পরিস্থিতি) হলেও, নেতার দায়িত্ববোধ আছে, একজন সাধারণ লোকের মতো অসুবিধার দোহাই দিয়ে সমস্যা আছে বলে সে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। হি মাস্ট নো, হি ইজ নট অ্যান অর্ডিনারি ম্যান, তাকে বুঝতে হবে যে সে একজন সাধারণ মানুষ নয়, সে জানে হাউ টু হ্যান্ড্‌ল ইট, কীভাবে সমস্যাকে মোকাবিলা করতে হয় সে জানে। সেজন্য নেতা বলতে শুধু নাম বোঝায় না, নেতা মানে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা। অথচ এই ক্ষমতা অর্জন করার সংগ্রাম প্রতিনিয়ত চালিয়ে যেতে হয়, নেতা-মাত্রকেই তা জীবনভর করতে হয়, এমনি এমনি যে তা অর্জিত হয় না, সেটা অনেকে ধরতেই পারে না।

বর্তমান সমাজে বুর্জোয়া-প্রোলেটারিয়েটের যে শ্রেণীসংগ্রাম চলছে, সেই শ্রেণীসংগ্রাম বা শ্রেণী-দ্বন্দ্বের প্রভাব আমাদের চিন্তা-ভাবনা-মানসিকতার ক্ষেত্রে, রুচি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিয়তই কাজ করে চলেছে। শ্রেণীসংগ্রাম কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, আন্দোলনের ময়দানে মজুর এবং মালিকের যে লড়াই চলছে শুধুমাত্র সেইখানেই নয়, ভাবগত ক্ষেত্রেও মজুর-মালিকের লড়াইটা হাজির হয়েছে এবং আপনারা চান বা না চান, তা আপনাদের মনের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। এর একটা অংশ মালিকের, একটা মজুরের। এইভাবে নিয়ত সেটা কখনও আপনাকে মালিকের বুদ্ধি জোগায়, আবার কখনও বা আপনাকে মজুরের বুদ্ধি জোগায়। এইভাবে আমাদের সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম বাস্তবত অবস্থান করে। প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজপরিবেশের ভাবনা-ধারণাগুলো স্বাভাবিক নিয়মেই আপনাদের মধ্যে এসে বর্তায়। কোনও নেতা বা কর্মীই নিজেদের এই সামাজিক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে পারেন না। পারেন না বলেই প্রতিনিয়ত, যত বড় উঁচুদরের নেতাই হোন না কেন, তাঁকে সচেতন থাকতে হয়। নিজেকে রক্ষা করতে হলে তাঁকে সব সময় বুঝতে হয় যে, আমার মধ্যে যে মানসিকতা, চালচলন, স্টাইল ইত্যাদি প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে, সেগুলো বিপ্লবী জনসাধারণের বিপ্লবী উদ্দেশ্য এবং বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিংবা সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এই সাবধানতা সত্ত্বেও আপনাদের মধ্যে অবিপ্লবী বুর্জোয়া চিন্তা-ভাবনা আসতে পারে এবং এলেই যে একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল তাও নয়। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আপনারা ঠিক সময়ে তা ধরতে পারলেন কি না এবং সময়মতো তা শোধরাতে সক্ষম হলেন কি না। এটাই আসল কথা। আপনাদের নিজেদের মধ্যকার অবিপ্লবী চিন্তা-ভাবনাকে যদি আপনারা নিজেরা ধরতে পারেন তবে সেইটাই সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। ধরতে পেরে হয়ত নিজেকেই নিজে ছি ছি করলেন এবং তার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যা যা করার দরকার তাও করলেন। কারণ, বাইরের লোকলজ্জা একজন বিপ্লবীর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় না। নিজের ভিতর থেকে লজ্জাটাই আসল কথা। এটাই একজন বিপ্লবীর প্রধান শিক্ষা হওয়া উচিত। তা না হলে বাইরের লোক বড় করলে আমরা বড় হব, বাইরের লোক লজ্জা দিলে আমরা মাটির সঙ্গে মিশে যাব — এ হলে একজন বিপ্লবী একপাও চলতে পারবে না। কারণ, বিরুদ্ধ পরিবেশে একজন বড় বিপ্লবীর গায়েও সাধারণ মানুষ উত্তেজিত হয়ে অপরের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে থুথু ছেটাতে পারে। তার জন্য বিপ্লবী ছোট হয়ে যায় কি? এমনকী তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে, রাস্তায় পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে। মেরে ফেলতে পারে সেই মানুষগুলো, যাদের জন্য সে সর্বস্ব দিতে বদ্ধপরিকর। তার দ্বারা বিপ্লবীদের বে-ইজ্জতি এবং অসম্ভ্রম হয়

কি? না। পুলিশ যদি একজন সত্যিকারের বিপ্লবীর মতো বড় মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে থানা লক-আপে পেটায় তাতে যেমন তার বে-ইজ্জতি হয় না, আবার পুলিশ যদি তাকে 'স্যার'ও বলে তাহলেও তার সম্মান বেড়ে যায় না। যে সব বিপ্লবীরা এগুলোকেই মান-অপমানের ক্ষেত্রে বড় কথা বলে মনে করেন, তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত। তাঁরা হয়ত জানেন না যে, এরই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ এবং বুর্জোয়া সমাজের 'অহম্', যা নানা মূর্তি ধরে ভোল পাল্টে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে। আমরা তো প্রফেসর হতে চাইনি, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইনি, পয়সা কামাতে চাইনি, নাম করতে চাইনি — আমরা বিপ্লবী হতেই চেয়েছি। কিন্তু বিপ্লবী হতে চেয়েও 'স্যার' শুনলে একটু গর্ব হয়! আর পুলিশ লক-আপে পেটালেই বে-ইজ্জত হয়! বিপ্লবীর ইজ্জত বে-ইজ্জতের ধারণা এরকম নয়। তার ইজ্জত বে-ইজ্জত তার নিজের মধ্যে, তা না হলে তো মানুষ ওপরে তুললে তারা উপরে উঠবেন এবং মইটা কেড়ে নিলেই ধুপ করে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে ফেলবেন।

এই করে কোনও বিপ্লবীর চলতে পারে না — এইসব চেতনা এবং উপলব্ধিগুলো কর্মীদের মধ্যে এনে দিতে হবে। এনে দিলেই তারা সমস্ত প্রতিকূলতা এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার প্রেরণা পাবে।

তাই বিপ্লবী হিসাবে, একজন কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রাম একটি কঠিন এবং জটিল সংগ্রাম। যেমন, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হলে জনগণকে, শ্রমিকশ্রেণীকে অর্থনীতিবাদ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং রাজনৈতিক দিক থেকে জনতাকে সচেতন করে জনতার রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে বিপ্লবের আঘাতে ভাঙতে হবে — এত কথা একজন বিপ্লবী কর্মী জানার পরেও দেখা গেল যে, যখন তাঁর নিজের চাকরি চলে গেল, তখন উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করেছেন — বিপ্লব, পার্টি, ইউনিয়ন তখন তাঁর সব গোলমাল হয়ে গেল। অর্থাৎ যতক্ষণ নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তাঁর একটা চাকরি ছিল ততক্ষণ তার সঙ্গে বিপ্লবটাও ছিল। এ কথাটা তিনি একবারও ভাবেননি যে পার্টি ও বিপ্লবের প্রয়োজনে কখনও তাঁর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নও তো আসতে পারে? শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তাঁর চাকরি যদি যায়ও তাহলেও তিনি শ্রমিক ইউনিয়নই করবেন এবং শ্রমিকরা তাঁকে যেভাবে রাখবে তিনি সেইভাবেই থাকবেন — এত কথা কর্মীটি এর আগে ভাবেননি। অনেকে অনেক কথা জানেন কিন্তু ভাবেন না যে, কোনও একজন কর্মী যদি ইঞ্জিনিয়ারও হন তাহলেও শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য, মেলামেশার সুবিধার জন্য দরকার হলে তিনি একটি কুলির কাজ বা বদলি শ্রমিকের কাজ নিয়েও কারখানায় ঢুকবেন। অথচ আমাদের এখানে কী দেখা যায়? শ্রমিক সংগঠনের প্রয়োজনে কোনও ইঞ্জিনিয়ার কর্মীকে একটি চাকরি করতে হবে বললে তিনি হয়তো তার প্রফেশন-এর (বৃত্তির) কাজ পাওয়ার চেষ্টা করেন, আর না পেলে বারবার এসে বলেন, কী করব, কাজ পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ হোয়াইট কলার এমপ্লয়ির যে মেন্টাল কমপ্লেক্স (লেখা-জোখার কাজ করার যে মানসিক গঠন) রয়েছে, তিনি তাঁর শিকার। তাঁর অবস্থা হচ্ছে একটা লেখাপড়া জানা লোক হয়ে কী করে তিনি ম্যানুয়াল লেবার-এর (কায়িক শ্রমের) কাজ করেন? তাঁর সঙ্গে খাপ খায় এরকম একটা কাজের বন্দোবস্ত যদি করে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা তিনি করবেন, অর্থাৎ কাজটা করে তিনি বিপ্লব করবেন, কিন্তু সে কাজটাও তাঁর একটু মনোমতো হওয়া দরকার। কাজটা মনোমতো যদি না হয়, তাহলে বিপ্লবের জন্য যা করা দরকার তা তিনি করতে পারেন না। এই যে মানসিকতা, যুক্তি এবং দেখবার ভঙ্গি, এসব যুক্তিধারা এবং ধারণাগুলি আসছে কোত্থেকে? বিপ্লবের এত কথা জানলেও এই চিন্তাগুলো তাঁর মধ্যে বিপ্লবী চিন্তার পাশাপাশি এই কারণে চলছে যে, এই বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত অবসোলিট (গলিত) ভাবনা-ধারণাগুলি জীবনযাত্রার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে তার প্রতিও তাঁর আগ্রহ কম নয়। এইভাবেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রভাব ভাবগত ক্ষেত্রেও প্রতিটি ব্যক্তির জীবনেই বর্তাচ্ছে। একটি বিপ্লবী কর্মীকে এ সম্পর্কে সব সময়ই সচেতন থাকতে হয় এবং বিপ্লবী হিসাবে জীবনকে গড়ে তোলার জন্য নিয়ত সচেতন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়।

বিপ্লবী কর্মী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার প্রাথমিক স্তরে আর একটি ট্রেন্ড অনেকের মধ্যেই কাজ করে। যেমন, আমার দাদাস্থানীয় একজন, এখানে আসতে আসতে আমাকে বলছিলেন যে, একটি ছেলে স্টিল প্ল্যান্ট-এ কাজ করে, অত্যন্ত সোস্যাল (মিশুকে), পাড়ায় আড্ডা দেওয়া থেকে শুরু করে মড়া পোড়ানো, দুর্গাপূজা প্রভৃতি প্রতিটি ব্যাপারেই তার প্রচণ্ড ইনিশিয়েটিভ (উদ্যোগ)। সকলের সে লিডার, সকলেই তাকে পছন্দ করে, ভালবাসে। কিন্তু তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। রাজনীতি ও বিপ্লব বোঝার পর দেখা গেল সে আর

কারোর সাথে মেশে না, পাড়ার পাঁচটা কাজের মধ্যে নেই। ছেলেরা আর তাকে মানে না। রাজনীতি বোঝার পর তার নেতৃত্ব তো আরও পাকাপোক্ত হওয়ার কথা, লোকের তাকে আরও পছন্দ করার কথা। তা উল্টো ঘটনা ঘটছে কেন? ঘটছে দুটো কারণে। প্রথম, সে যখন বিপ্লবী হচ্ছে, শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই সে এতদিন যে মানুষগুলোর সঙ্গে ছিল, সচেতন ভাবে না হলেও তাদের সম্পর্কে খানিকটা অবহেলা করতে শুরু করে। যাদের সঙ্গে এতদিন মহানন্দে কাটিয়েছে, তাদের সম্পর্কে ভাবতে শুরু করে যে, কী সব বাজে লোক; এরা নিজেদের মধ্যে যা আলোচনা করে তা কানেও নেওয়া যায় না। ফলে যারা তার কাছে কথায় কথায় আসত, কুকুরের ঘ্রাণশক্তির মতো ইনটুইশন-এ তারা ফিল করতে পারে (বুঝতে পারে) যে এ লোক আর আমাদের লোক নয়; এবং খানিকটা ভয়ভীতিতে বা খানিকটা ভুল বুঝেও তার থেকে দূরে সরে যায়। দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই বিপ্লব বোঝার সাথে সাথেই সে তাদের পেলেই বক্তৃতা করে, ধরেই 'লেকচার' দেয়। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে মাস্টার মশায়ের মতো এত সারগর্ভ ভাষণ কার শুনতে ভাল লাগে? ফলে এরা ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে তাকে দেখলেই পালিয়ে যায়। মানে, আগে যার কাছে দশবার যেত, এখন তাকে একদিক থেকে আসতে দেখলে, 'এইরে, লেকচার দিতে আসছে' ভেবে সঙ্গে সঙ্গে ঐদিক দিয়ে পালিয়ে যায়। এগুলি কী ইন্ডিকেট (ইঙ্গিত) করে? ইঙ্গিত করে যে বিপ্লব তার ভালভাবে বোঝা হয়নি। বিপ্লব ঠিক মতো বুঝলে সে বুঝত যে, এইসব খারাপ মানুষগুলোর মধ্যে, নিপীড়িত মানুষগুলোর মধ্যে থাকার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। যেমন আগের দিনে ধর্ম প্রচারকরা মনে করতেন।

আর তাদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে, আমাকে এমন স্টাইল-এ মিশতে হবে যাতে তারা আমাকে ছেড়ে যেতে চাইলেও, আমি ছেড়ে যাব না। আমাকে আমার নিজের অস্তিত্বটি, বিপ্লবী সত্তাটি বিসর্জন দিলে চলবে না। অর্থাৎ আমি তাদের বন্ধু হব, ইয়ার হব না, আবার প্রিচার-ও (প্রচারক) হব না, আমি বিপ্লবীই থাকব এবং তার বন্ধুও থাকব। এগুলো একসঙ্গে করার স্টাইল-টি আয়ত্ত করতে পারলে কারোর সঙ্গে থাকার অসুবিধা আমার হয় না। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই উল্টো হয়। হয় মিশতে গিয়ে ইয়ার হয়ে যায়; ফলে তাদের পরিবর্তন কিছুই করা যায় না, কিছু শেখানোও যায় না বরং নিজে যতটুকু বিপ্লব বুঝেছিলাম আস্তে আস্তে সেটুকুও চলে যায়। আমার চরিত্রটিও নষ্ট হয়ে যায়। আর না হয় তাদের কাছে আমি ভীতির কারণ হয়ে পড়ি। এগুলি ভাল করে একজামিন করলে, সাইকোজেনেসিস (মানসিকতায় এগুলি উৎপত্তির কারণ নির্ণয়) করলে দেখা যাবে এ সমস্তই বুর্জোয়া সমাজ থেকে আহরিত কুসংস্কার বা চিন্তাগত, ভাবগত বিভ্রান্তি, যেগুলি প্রমাণ করে যে, বিপ্লব সম্পর্কে আমাদের কারেক্ট গ্র্যাস্পিং (সঠিক উপলব্ধি) হয়নি।

প্রতিটি কর্মীর কাজ হচ্ছে তার ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভিত্তিতে ক্রমাগত জনসংযোগ বাড়িয়ে যাওয়া। ব্যক্তিগত উদ্যোগ বলতে আমি বোঝাতে চাইছি যে, সংগঠন আমাকে একটা প্রোগ্রাম দিচ্ছে, কতকগুলি দায়িত্ব দিচ্ছে, সেগুলি আমি করছি, আবার সংগঠন কাজ না দিলে আমি কাজ সৃষ্টি করছি। এরকম নয় যে, কাজ দিতে না পারলে আমি করছি না এবং বলছি, আপনারা তো কাজ দেননি। অথচ, একজন সচেতন কর্মী সংগঠন যে কাজগুলি দেয়, সেগুলি তো করেই, তার উপর সে নিজে কিছু কাজ সৃষ্টি করে। একজন সচেতন বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী অর্থেই আমি আমার রুচি, রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক জ্ঞান এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা নিয়েই জনগণের মধ্যে থাকি বলে আমার চিন্তাগত এবং সংগঠনগত প্রভাব তাদের উপর বর্তায়। ফলে তাদের জীবনের নানা সমস্যা, যেগুলো হয়ত সাংগঠনিক পরিকল্পনার মধ্যে ধরা হয় না বা আনা হয় না, আমি সেই বিষয়গুলো সমাধানের প্রশ্নেও নেতৃত্ব দিই। সেখানেও আমি তাদের গাইড করি, হেল্প করি এবং এইভাবে তাদের আমি সচেতন রাজনৈতিক কর্মীতে ট্র্যান্সফর্ম (পরিবর্তিত) করি, শুধু ইউনিয়ন করি না। ইউনিয়নও করি, আবার প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব সমস্যা নিয়ে মাথাও ঘামাই। ডাকার অপেক্ষায় বসে না থেকে প্রতিটি কাজ ও সমস্যার ক্ষেত্রে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি। ব্যক্তিগত উদ্যোগ বলতে আমি একটি কর্মীর এই ধরনের টাইপ অব একজিসটেন্স (অস্তিত্ব) থাকা উচিত বলে মনে করি; অথচ উল্টো একটা মানসিকতাও আছে। অনেকে ভাবেন, হ্যাঁ, আমি নেতা লোক। আমাকে তো খবরই দেয়নি, তাহলে আমি কেন যাব? তাঁরা বলেন, আমাকে কি আপনারা খবর দিয়েছেন? আরে বাবা, আমাকে যদি খবর না দিয়ে থাকে সেটা অন্যায় নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার জনগণের প্রতি যে দায়িত্ববোধ তা পালন না করে আমি তো আর একটা বাড়তি অন্যায় করলাম। ওর অন্যায় দেখিয়ে, তাদের পরিকল্পনার ত্রুটি দেখিয়ে একজন সচেতন কর্মী হিসাবে আমার কী অধিকার আছে — আমার নিজের যে জনগণের প্রতি দায়িত্ব আছে, যেটা কন্সট্যান্ট অ্যান্ড কনটিনিউয়াস (নিয়ত ও নিরবচ্ছিন্ন) — তাকে

এড়িয়ে যাওয়ার? আমি সচেতন বলেই, বুঝেছি বলেই পার্টি বা ইউনিয়নের যে প্রোগ্রাম বা নীতি আমি জানি, সেই অনুযায়ী কেউ ডাকুক আর নাই ডাকুক, আমি তাদের প্রতি আমার যে দায়িত্ববোধ তা পালন না করে পারি না, তাদের সাহায্য না করে পারি না। একজিকিউটিভ, কর্মকর্তারা আমাকে যদি না ডাকে, তাচ্ছিল্য করে এড়িয়ে যায়, প্রোগ্রাম না দিয়ে থাকে তাহলে অন্যায় তারা করল ঠিকই, কিন্তু তাদের কাজের ত্রুটি দেখানোর উদ্দেশ্য কি নিজের ত্রুটির যুক্তি খোঁজা, নিজের ত্রুটি চাপা দেওয়া? নাকি, আমি ত্রুটি দেখাচ্ছি এই কারণে যে, তাদের আমি ত্রুটিমুক্ত করতে চাই? নাহলে তো তাদের একটি ত্রুটি দেখিয়ে আমার মতো করে আর একটা অন্যায় করার অধিকার আমার নেই। আমার জনগণের প্রতি যে দায়িত্ব সেটা আমি পূরণ করব না কেন? এইসব জিনিসও ঘটে।

আরও একটি ত্রুটি হামেশাই কর্মীদের ক্ষেত্রে ঘটে, সেটা হচ্ছে দশ মিনিটের আলোচনায় যে বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়ার কথা, সেই আলোচনা আমরা দু'ঘণ্টা ধরে করি। একবার আলোচনায় বসলে আর উঠতেই চাই না। কাজের পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করতে গিয়ে আলোচনায় বসে যত অকার্যকরী কথা একটার সঙ্গে আর একটা টেনে এনে কাজকে দ্রুততর বা পরিষ্কার করার পরিবর্তে অহেতুক আলোচনাকে টেনে টেনে বড় করে ফেলি। ফলে কী হয়? যে সময়টা আমরা কাজ করতে পারতাম, সেই সময়টা নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করে, একে অপরের দোষ দেখিয়ে, পরস্পর তিক্ততা সৃষ্টি করে, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করে আমরা কাটিয়ে দিই। আমাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগঠন করার ক্ষমতা এর দ্বারা খানিকটা মরতে থাকে। সেজন্য সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। আমাদের স্লোগান হবে, কন্সট্যান্ট কমন ডিসকাশন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন, কন্সট্যান্ট কমন অ্যাক্টিভিটি, নিয়ত সম্মিলিত আলোচনা ও একত্রে চলা এবং নিয়ত একত্রে কাজ করা। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেমন কাজ করা, আবার একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা। ছোটর সঙ্গে যেমন পারি, তেমনি বড়র সঙ্গেও একত্রে ঐক্য বজায় রেখে কাজ করতে পারি। সমানে সমানে পারি। এগুলো শিখতে হয়। এরই জন্য রেভোলিউশনারি ট্রেনিং। এই যে ট্রেনিং ক্যাম্প, ক্যাডার ক্যাম্পগুলো হয়, লেখাপড়া শেখার পরও, বিএ, এমএ পাশ করার পরও থিওরেটিক্যাল ট্রেনিং, ক্যাডার ট্রেনিং নিতে হয়, কোনও স্কুল-কলেজে পড়ে এগুলো শেখা যায় না। এগুলো হাতে-কলমে শিখতে হয়। শিখতে হয় — লোকের সঙ্গে পারস্পরিক তিক্ততা না করে কীভাবে একত্রে কাজ করা যায়। অপরে আমার সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে চাইলেই আমি আসব কেন? আমি তার শিকার বনে যাব কেন? আই মাস্ট নো অ্যান্ড লার্ন হাউ টু বাইপাস ইট, কী করে তা এড়িয়ে যেতে হয় তা আমার জানতে হবে, শিখতে হবে। অনেকে পিছল মাছের মতো স্লিপ করে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু আমার কাজ হচ্ছে সে বেরিয়ে যেতে চাইলেও কোনও না কোনও প্রকারে তাকে কাজের মধ্যে টেনে আনা, লড়াই-এর কর্মসূচি দেওয়া, এই গুণটি অর্জন করার নামই হোল সংগঠন-ক্ষমতা অর্জন করা; অথচ অনেক ক্ষেত্রেই উল্টো ব্যাপারটা ঘটে।

উনি আমাকে এই বললেন, তাহলে ওঁর সঙ্গে কাজ করা কীভাবে চলতে পারে? এ রকম হলে মানুষ কাজ করতে পারে? — ইত্যাদি নানা অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ, কে ঠিক আর কে বেঠিক, এই আলোচনা করতে করতেই সময় নষ্ট করলাম। কাজ ফেলে রেখে অযথা সময় নষ্ট করলাম, নিজের ক্ষমতাও নষ্ট করলাম, তাকেও কিছু করতে সাহায্য করলাম না। এর মানে, আমরা কখনও আলোচনাই করব না, এটা নয়। আলোচনা না করে আমরা এক পা-ও এগোতে পারব না। তাই আমাদের স্লোগান হবে — কন্সট্যান্ট কমন অ্যাক্টিভিটি, কন্সট্যান্ট কমন ডিসকাশন। কিন্তু এই আলোচনাগুলি হওয়া চাই নৈর্ব্যক্তিক, বাস্তবসম্মত এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আলোচনা সংক্ষিপ্ত না হলে প্রিসাইজ না হলে, কাজের দিকে, ঐক্যের দিকে, ভাল বোঝাবুঝির দিকে না গিয়ে আলোচনা শুধুই অযথা বেড়ে যাচ্ছে — একথার মানে হল, যেদিক দিয়েই হোক, আমিই হই বা অপর পক্ষই হোক — আমরা কোনও পক্ষই এমন ক্ষমতাসম্পন্ন নই, যারা আলোচনাটাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করতে পারি। যেখানে আলোচনায় কথা বাড়ে, সেখানে বুঝতে হবে যে, আলোচনা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে সহজ বুদ্ধি খাটিয়ে আলোচনা বন্ধ করা উচিত। আলোচনা বন্ধ করে বলা উচিত, এসো, দু'কাপ চা খেয়ে নিই। তারপর চলো এইবার কাজ করতে যাই। এটা না হয় মুলতুবি থাকল। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কেন না, এটা এমনিই টেনে টেনে বাড়ছে। যে জিনিস শুধু বাড়ে, কমে না, তা না করলেও চলে। চলো, হয় এই কাজটা করি, না হয় একটা জায়গায় ঘুরে আসি। এই যে সহজবুদ্ধি বা

উপস্থিত বুদ্ধি, নিজের আলোচনার ঝোঁকটাও বুঝতে পারার ক্ষমতা, এ আমাদের প্রত্যেককে অর্জন করতে হবে। তবেই আমরা জনগণের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারব।

না হলে, বন্ধু-বন্ধুর মধ্যে বোঝাপড়া নষ্ট করে ফেলবে। কমরেড-কমরেডের মধ্যে সমালোচনায় এনিমোসিটি (শত্রুতার মনোভাব) সৃষ্টি হবে। মতবিরোধ হলে, আপনার ভুলটা আমি একটু ধরিয়ে দিলে, আপনার মন খারাপ হয়ে যাবে। অথচ, আপনাকে সাহায্য করার জন্য, আপনার উপকারের জন্য ভুল ধরিয়ে দিলে মন খারাপ হবে কেন? ভুলটা ধরিয়ে না দিলে কী হত? একটা মিথ্যা সম্মান রক্ষা হত। কিন্তু আপনি তো ঐ ভুলের পথ বেয়েই আরও নিচে নেমে যেতেন। অথচ ভুল ধরিয়ে না দিয়ে আপনার সর্বনাশ করলে আপনি আরও বেশি খুশি? এ কী? এর মানেটা কী? এর মানে হচ্ছে, আপনার আত্মচেতনাই নেই। বিপ্লব দূরের কথা, সংগঠনের স্বার্থ তো দূরের কথা, আপনি নিজের ভালমন্দও ভাল করে বোঝেন না। মার্কসবাদ সেজন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে — বলেছে সমালোচক হচ্ছে শিক্ষক। বলেছে, শত্রুর কাছ থেকেও শেখো, লেম্যান-এর (সাধারণ মানুষের) কাছ থেকে শেখো। লে-ম্যান কি আপনারা যত কথা বলেন তা বলতে পারে? না তার অর্ধেকও বোঝে? তাহলে এই সব বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোক এই কথাগুলি বলেছে কেন? না, বলেছে এই কারণে যে, অনেক সময় একটা অজ্ঞলোক এমন কথা বলতে পারে যেটার মধ্যে স্টার্টলিং থিং (বিস্ময়কর জিনিস) থাকে, যা আপনার শেখবার বিষয়, আপনি এত কথা জেনেও যে কথাটা লক্ষ করেননি। চোখ-কান খোলা থাকলে সেই মুহূর্তে লেম্যান-এর ঐ কথাটি আপনার চিন্তার অনেক জিনিস পরিষ্কার করে দিতে পারে। কিন্তু ও কী বলবে — এই ভেবে যদি চোখ-কান বন্ধ রাখেন, মনের দরজা আটকে রাখেন তাহলে এই মুহূর্তে তার একটি কার্যকরী কথা, যা আপনার এত জ্ঞান সত্ত্বেও আপনার দৃষ্টিশক্তিকে খোলেনি, তা আপনার জানার বাইরে থেকে যাবে। এতে আপনারই ক্ষতি।

তাই সর্বদাই চোখ-কান খোলা রাখো, পঞ্চেন্দ্রিয় খোলা রাখো। শেখবার কিছু হলে সে শত্রুই বলুক, মারবার মুহূর্তেই বলুক, মারতে মারতেই বলুক, শিখে নাও। এইভাবে নিজেকে খোলা রাখো, পরিবর্তিত করো। যে সমালোচক, সে হয়ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সমালোচনা করল। কিন্তু ভেবে না বললেও যে কথাগুলি সে বলেছে, একটু খোঁজ করে দেখি, যদি তার থেকে আমার নিজেকে কিছু শোধরাবার থাকে। মোটিভেটেড ওয়ে-তে বললেও, মোটিভ-টা না হয় পরেও ফাইট করা যেতে পারে, কিন্তু সেই মুহূর্তে মোটিভ-টাই যদি আমার মনকে আচ্ছন্ন করে তাহলে তার মধ্যে কিছু সত্য থাকলে তা আমার নজরের বাইরেই থেকে যাবে। এইটাই হচ্ছে সমালোচনাকে ও সমালোচককে নেওয়ার ক্ষেত্রে, গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। সেইজন্য সমালোচকও শিক্ষক। এইসব আমার কথা নয়। ভাববেন না যে, এই শিবদাস ঘোষ লোকটা সব বানিয়ে বানিয়ে নিজের মতো করে, প্রিচার-এর মতো করে এসব বলছে। আপনারা মার্কসবাদ ভাল করে পড়বেন। ঐ সব চটি বই নয়। একদল তথাকথিত মার্কসবাদী নেতা আছেন যাঁরা ঐ সব চটি চটি বই পড়েন, সেগুলি নয়। থরোলি (গভীর ও সম্পূর্ণতার সঙ্গে) মার্কসবাদ পড়ুন, জানুন। তার এথিকস, ভ্যালুজ, ফিলজফি-র (নীতি-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ, দর্শন) খোঁজ খবর নিন। নিলে দেখবেন আমি যা বলছি, এগুলিই হল তার সার কথা। মার্কসবাদকে এভাবে না বুঝলে মনে হবে, যেন না খেতে পাওয়া, অভাব বা দুঃখ-কষ্ট থেকেই লোকে মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। খেতে পায়নি বলে মার্কসবাদী হয়েছে — ব্যাপারটা এমন নয়। সকল দেশেই, এ যুগে যারা বড় মানুষ, চিন্তাশীল, দরদী মনের মানুষ, মানুষের প্রতি অসীম মমত্ববোধ থেকেই তাঁরা মার্কসবাদের প্রতি ঝুঁকেছেন। তাঁদের অনেকেরই ঘরে খাওয়া-পরার অভাব ছিল না। এমনকী শোষকের ঘরে, জোতদারের ঘরে, ধনী পরিবারে জন্ম তাঁদের অনেকেরই। যেমন মাও সে-তুঙ, এঙ্গেলস এবং অনেকেই, এঁদের কারোরই ঘরে অভাব ছিল না। শুধু এথিকস-এর জন্য, নোব্‌ল অ্যান্ড হায়ার ইডিয়লজি-র (মহৎ এবং উন্নত আদর্শের) জন্য, ভ্যালুজ-এর জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘেঁটে, এর চেয়ে মূল্যবান, মহৎ, বড় জিনিস আর খুঁজে পাননি বলেই তাঁরা মার্কসবাদী হয়েছেন। খেতে না পেলে লোকে মার্কসবাদী হয় — মার্কসবাদের আবেদনটা এরকম নয়। একটা আমেরিকান 'লবি' গ্রো করেছে (গড়ে উঠেছে), একদল টেকনোক্র্যাটস, এক্সপার্টস (কারিগরি বিদ্যার বিশারদ), তারা আমেরিকার রাজনীতিবিদ্‌দের বোঝাচ্ছে যে, এই মানুষগুলোর দুঃখ-দুর্দশাই হচ্ছে লালঝান্ডাওয়ালাদের বিপ্লব-টিপ্লবের আসল কারণ। বিপ্লবকে মেরে দেওয়া যায় যদি এই লোকগুলোকে অ্যালসেশিয়ান বানিয়ে দেওয়া যায়। একটু ভাল করে খেতে পরতে দাও, অ্যাফ্লুয়েন্ট কন্ডিশন অব লাইফ (জীবনে প্রাচুর্য) এনে দাও, দুটো নাইট ক্লাব খুলে দাও, ড্যাকা ড্যাং-এর বন্দোবস্ত করে দাও — হোক না মজুর, দেখবে বিপ্লব-টিপ্লব কিছু নয়।

কিন্তু খোদ নিজের দেশেই তারা লক্ষ করছে না যে, সমস্ত দেশের জনসাধারণকে, যুবকদের একটা যুগ ধরে দুটো ড্যাকা ড্যাং আর 'ইট, ড্রিংক অ্যান্ড বি মেরি'-র (খাও দাও ফুর্তি করো) স্লোগানে মাতিয়ে রেখেও জনগণের আন্দোলনমুখীনতাকে তারা মেরে দিতে পারছে না। আমেরিকার চেহারা পাল্টাচ্ছে। ভিয়েতনামে বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে, মানবতাকে লুণ্ঠন ও ধর্ষণ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে খোদ আমেরিকার জনসাধারণ আজ তাদের সরকারের বিরুদ্ধে গোটা দুনিয়ার মানুষের বিক্ষোভের মিছিলে সামিল হচ্ছে, তাদের হাতে হাত মেলাচ্ছে।

তাই যে কথা বলছিলাম, এই যে সমস্ত জিনিসগুলো আপনাদের ঘটে, এই সমস্ত জিনিসগুলোকে সামনে রেখে সংগঠন বাড়াবার ক্ষেত্রে আপনাদের দুটো কথা ভালভাবে বুঝতে হবে, মনে রাখতে হবে। এক হল, সংগঠন একটা আলাদা প্রশ্ন নয়, বিনা রাজনীতিতে সংগঠন বাড়াবার চেষ্টা হলেও কোনও কারণে যদি কখনও ব্যক্তির উদ্যোগ, একটা লোকের বা কতকগুলো লোকের সততা বা স্যাক্রিফাইস-এর ফলে মানুষজনের দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়ে বা এরকম কতকগুলো ঘটনাকে কেন্দ্র করে আপনারা আপনাদের সংগঠন বাড়িয়েও তোলেন, আপনারা তা টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। অ্যাপলিটিক্যাল (রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিবর্জিত) সংগঠন টিকে থাকে না, থাকবেও না। তাহলে আমরা যে সংগঠন করি তার রাজনীতিটি কী তা বুঝতে হবে। আর, বুঝতে হবে এই রাজনীতির দুটো দিক আছে — একটি অ্যাকটিভ পার্টি পলিটিক্স-এর দিক, আর একটা হচ্ছে যদি কেউ পার্টি পলিটিক্স করা পছন্দ নাও করে, তবুও রাজনীতি সঠিক কি বেঠিক এটা তাকে নির্ধারণ করতেই হবে। এটাকে বাদ দিয়ে মজুর আন্দোলন, মজুর সংগঠন, মজুরদের বিপ্লবী লড়াই কোনওটাই চলে না। এগুলো শুধু ফাঁকা কথাই নয়, এভাবে ভাবলে মারাত্মক ভুল হবে। এর ফলে কোন কিছুই গড়ে উঠবে না, এটা একটা, কী বলব, সেলফ-ডিসেপশন, খানিকটা নিজেকে ঠকানো।

সকল মজুরকে খোলাখুলি বলতে হবে — বাবা, রাজনীতি করাটা এত সোজা জিনিস নয়, বিপ্লবী রাজনীতি তো নয়ই। এমনি রাজনীতি করাও সোজা জিনিস নয়। রাজনীতির নামে বাঁদরামি করা সোজা জিনিস হতে পারে, কিন্তু সরাসরি সারা জীবন ধরে রাজনীতি করবে, এটা একটা সহজ জিনিস নয়। তা, তুমি তার জন্য এত উদ্বিগ্ন কেন? রাজনীতি করা একটা জিনিস, আর রাজনীতি সঠিক কি বেঠিক, সেটা বোঝবার চেষ্টা করা এবং সেই অনুযায়ী কোন রাজনৈতিক লাইন ধরে চলব তা ঠিক করা আর এক জিনিস। সেটা ঠিক করলেই কারোর রাজনীতি করতে হয় না। অথচ সেটা ঠিক না করলে কোনও লড়াই, কোনও মানবিক লড়াই আজকের দিনে হতে পারে না, কোনও সংগঠনই দানা বাঁধতে পারে না — দ্যাট ইজ এ মিথ্ অব অর্গানাইজেশন (সেটা হল সংগঠন সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা)। ফলে এ দুটো জিনিস তাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার। তাদের বলা দরকার, এত ভয় পাচ্ছ কেন? পার্টি পলিটিক্স-এর কথা শুনলে এত ভয় পেয়ে যাও কেন? জোর করে কাউকে পার্টি করানো যায় কি? বিপ্লবী পার্টি তো করানো যায়ই না। যতক্ষণ না বুঝছ, তোমার উদ্বিগ্ন হবারও প্রয়োজন নেই, দরকারও নেই। কিন্তু একটি জিনিস অবশ্যই দরকার, আর তা হল, রাজনীতি তোমাকে বুঝতেই হবে। তুমি যদি বল, না, না, রাজনীতি বোঝবার দরকার নেই, তাহলে তুমি না বুঝলেও, রাজনৈতিক স্থিতি এবং চিন্তাভাবনা, যা ভুল, তা যদি দেশে চলতে থাকে এবং তার প্রভাব যদি বাড়তে থাকে তাহলে, যে তুমি রাজনীতি থেকে গা বাঁচাতে চাইছ, সেই তুমি তোমার চিন্তা-ভাবনা, রুচি, সংস্কৃতি, পরিবার এমনকী যে সংগঠনটি তোমরা এখানে খাড়া করতে চাও, সে সবই তো সেই ভুল রাজনীতির প্রভাবে বরবাদ হয়ে যাবে, তাকে তুমি রক্ষা করতে পারবে? এভ্রি মুভমেন্ট ইজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই পলিটিক্স, প্রতিটি আন্দোলনই রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত। তার প্রভাব থেকে খাদ্য থেকে শুরু করে সব কিছু, মেডিসিন পর্যন্ত মুক্ত নয় — আপনি নিজেকে আলাদা রাখবেন কী করে? ইউ আর এ সোস্যাল বিয়িং (আপনি সামাজিক সত্তাবিশিষ্ট মানুষ)। সংগঠনের কথা তো বহু দূর, এর একটি ব্যক্তি মানসিকতা পর্যন্তও তার থেকে মুক্ত রাখার উপায় নেই। আপনি ভাবতে পারেন, আমি আলাদা থাকব; এ সম্পর্কে আপনি অনবহিত থাকতে পারেন। আপনার চিন্তা-ভাবনা এরকম থাকতে পারে যে, আমি কারোর সঙ্গে, কারোর সংস্পর্শে নেই। এর মানে হোল আপনি অনবহিত। আপনি জানেন না কীভাবে আপনি সমাজের সঙ্গে প্রতিনিয়তই সম্পর্কিত হচ্ছেন, কীভাবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ আপনার মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করছে, আপনার সংগঠনের মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করছে, সংগঠন পরিচালনার কায়দার উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এই যেটাকে বলছেন, স্টাইল অব অর্গানাইজেশন, সংগঠন পরিচালনার পদ্ধতি বা কৌশল, এই স্টাইল অব অর্গানাইজেশন কথাটার

মধ্যেও বুর্জোয়া ভাবনা-ধারণা, প্রোলেটারিয়েটের বিপ্লবী ভাবনা-ধারণা প্রতিফলিত হয়।

যেমন ধরুন একটা ইলেকশন এসে গেছে, তার লড়াই লড়বেন। আপনি ভাবছেন — এটা নির্বাচন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ছেন, এর মধ্যে আবার বিপ্লবী রাজনীতির কী আছে? আপনার ধারণা হচ্ছে, কংগ্রেসকে পরাস্ত করার যে কোনও কৌশলটাই বিপ্লবী। না। ইলেকশনে কংগ্রেস একটা পক্ষ, বিপক্ষ দল আর একটা পক্ষ, তার মধ্যে জনসাধারণ এসে যাচ্ছে।

যতদিন বিপ্লব না হয়, জনতা ইলেকশন চাক বা না চাক, পছন্দ করুক আর নাই করুক, ভাল লাগুক, মন্দ লাগুক, জনতাকে টেনে আনা হয়, জনতা এসে যায়। বিপ্লব মানে হল, যখন জনতা বুঝে ফেলেছে ইলেকশন-এর প্রয়োজনীয়তা নেই, যখন সকলে এই চেতনার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে গেছে এবং সংগঠিত ভাবে ইলেকশন বর্জন করছে, নেগেটিভলি বর্জন করছে না, পজিটিভলি তারা আপরাইজিং গণঅভ্যুত্থান করার জায়গায় চলে গেছে, যখন সে বলে, না ইলেকশন নয়, ক্ষমতা দখল, তখনই একমাত্র ইলেকশন অকার্যকরী হতে পারে, না হলে ইলেকশনে জনতা বার বার ফেঁসে যায়। আর জনতার সঙ্গে থাকবার জন্য বিপ্লবী হোক, অবিপ্লবী হোক সকলকেই ইলেকশন-এ যেতে হয়, সত্যিকারের বিপ্লবীকেও যেতে হয়। শুধু ঐসব সেকটেরিয়ান ট্রুইজম-এর চর্চা যারা করে, যারা বিপ্লবের চর্চা করে না, তারা গা বাঁচায়, না হলে সকলকেই যেতে হয়। তাহলে গেলে সকলের কি দৃষ্টিভঙ্গি এক হবে? ইলেকশন তো সকলেই করছে, বাইরের দিক থেকে দেখলে, আমি করছি, বিপ্লবী লেনিনবাদীরাও করছি, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরাও করছে, খাঁটিরাও করছে, মেকিরাও করছে, বুর্জোয়ারাও করছে, মেকি সমাজতন্ত্রীরাও করছে। আর সকলেরই কথা হবে আমি ঠিক, বিপক্ষ দল বেঠিক। তাহলে বিপক্ষ দলকে হারাবার জন্য যে কোনও কৌশলটাই হচ্ছে সঠিক, কারণ আমি সঠিক। এইভাবে যদি আপনি যুক্তি করতে থাকেন, তাহলে বুর্জোয়া আর আপনার মধ্যে কোনও শ্রেণীগত পার্থক্য থাকে না, দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য থাকে না, অথচ গভীর বিচার-বিশ্লেষণে এটা ভুল প্রমাণ হয়।

আসলে বুর্জোয়া আর প্রোলেটারিয়েট এ দু'জনেরই লড়াইয়ের কলা-কৌশল, কায়দা, সংগঠন পদ্ধতি, ইলেকশন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি, জেতা-হারার কলা-কৌশলটি ঠিক করাও দেশের বাস্তব বিপ্লবী আন্দোলন, গণচেতনার স্তরের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। বুর্জোয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচনী আসন দখল করা এবং করে ক্ষমতায় যাওয়া। ক্ষমতায় গিয়ে নানা রিফর্মস (সংস্কারমূলক কাজ) করে, নানা স্লোগান তুলে এই এগ্‌জিসটিং সিস্টেম-কেই (বর্তমান ব্যবস্থা) টিকিয়ে রাখা। যেমন করে বললে আমি জনতার মধ্যে প্রগতিশীল সেজে কিছু দিন তাকে বিভ্রান্ত করতে পারি, বোকা বানাতে পারি এবং এই ব্যবস্থাটাকেই দীর্ঘস্থায়ী করতে পারি — এ হল তাদের উদ্দেশ্য। তাহলে তার মূল লক্ষ্য হয়, যেভাবেই হোক সর্বাধিক নির্বাচনী আসন দখল কর। এটা ছাড়া রাজনৈতিক কর্মসূচি, আশু কর্মসূচি এগুলোও সে দেয়। এই প্রোগ্রাম ও স্লোগান তাদের যাই হোক, তাদের মূল কথা হচ্ছে, গ্র্যাব ম্যাক্সিমাম সিটস।

আর বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতার লক্ষ্য থেকে প্রোলেটারিয়েট যখন অনন্যোপায় হয়ে জনতার সঙ্গে থাকার জন্য নির্বাচনী লড়াইয়ে যায়, তখন সে একটা জনতার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে যায়। সিট জেতবার জন্য সেও চেষ্টা করে সাধ্যমতো। কিন্তু তার উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দুটা কখনই যেভাবেই হোক সর্বাধিক আসন দখল করা হয় না। তার মেইন ফোকাল পয়েন্ট-টা হয়, পিপ্‌ল-কে, জনতাকে, একটা মাস রেভোলিউশনারি লাইন-এর (জনতার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের) ভিত্তিতে ইলেকশন লড়াই করতে শেখানো এবং এইটা করতে গিয়ে ম্যাক্সিমাম সিট পাই পাব, যদি না পাই, একটাও না পাই, না পাব। যদি দশটা রক্ষা করতে পারি, দশটাই করব, কিন্তু তার সেন্ট্রাল ফোকাল পয়েন্ট কখনই হবে না — যেন তেন প্রকারেণ, যে কোনও উপায়ে কতকগুলো সিট গ্র্যাব করা।

হোয়াট ইজ দ্যাট মাস লাইন অ্যান্ড মাস স্টাইল অব অ্যাক্টিভিটি? জনতার সেই বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতিটি কী, যেটা ইলেকশন-এ জনসাধারণের কাছে আমি নিয়ে যাব? জনতার মধ্যে আমি যাব এই কথা নিয়ে — তুমি যখন ইলেকশন করছই তখন পিপ্‌ল-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তোমাকে বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে ইলেকশন করতে হবে। সেটা করতে গিয়ে তোমার নিজের ঘাঁটিগুলি তুমি নিজে সামাল দাও। যে কয়টা সিট পাও, যতগুলো ম্যাক্সিমাম পার, এমনকী যদি সব সিটই জিততে পার, এর ভিত্তিতে এই লাইনের ভিত্তিতেই জেত। কিন্তু একমাত্র এর ভিত্তিতেই, এটাকে গোলমাল করে দিয়ে নয়। শত্রুকে হারাবার জন্য যা দরকার তাই কর — এসব যুক্তি যদি তুমি তোল, আর বিপ্লবী তক্‌মা এঁটে তোল, তাহলে কিন্তু বুর্জোয়ারা

যেভাবে ইলেকশন ফাইট করে, তুমিও আসলে সেই কৌশলটি, সেই কায়দাটি এবং সেই একই ট্যাকটিক্সটাকেই বিপ্লবের নামে চালু করার চেষ্টা করবে। এতে কি বিপ্লবী হওয়া যায়? এর দ্বারা কি বিপ্লবের কাজ এগোয়? না, এতে বিপ্লবী হওয়া যায় না এবং এর দ্বারা বিপ্লবী কাজও এগোয় না। এর ফলে, আমরা যে বলি ইলেকশন-এর মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি পলিটিক্সকে এক্সপোজ করব, তা হয় কি? এই কথাটা মুখে বলা আর কাজে করা এক জিনিস নাকি? একদল শুধু মুখে বলে, আর একদল বাস্তবে করে। কাজেই কারা এটা শুধু মৌখিকভাবে বলছে, আর কারা প্রকৃতই সেই অনুযায়ী কাজ করছে, এ সম্পর্কে পিপ্‌লকে, জনতাকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করাটাই হল আসল জিনিস।

যেমন আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐক্যের কথা সকলেই বলছে, কিন্তু কে শুধু বলছে আর কে ঐক্যের জন্য যা যা করা দরকার সেই অনুযায়ী কাজ পারুক না পারুক করছে, সেটা জনসাধারণকে দেখান, দেখান আর একদল ঐক্যের কথা বলছে কিন্তু বাস্তবে করছে যা, সেটি ঐক্য বিনষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। আর জনসাধারণকে একথাটি বোঝান, দুটো জিনিসের জন্যই ঐক্য তোমার দরকার। নিজের সংগঠনকে জোরদার করার জন্য ঐক্য দরকার, আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য ঐক্য দরকার। আবার ঐক্য দরকার বিপ্লবী রাজনীতিকে পরিষ্কার করার জন্য, মেকি রাজনীতি থেকে মোহমুক্তি ঘটাবার জন্য। সমাজে মোহমুক্তি ঘটাবার প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন দরকার, ফলে ঐক্য দরকার। কিন্তু এই ঐক্য নীতি বিসর্জন দিয়ে নয়, সংগ্রাম বর্জন করে নয়। ঐক্যের মধ্যে আদর্শের সংগ্রামের স্বীকৃতি চাই। যারাই ঐক্যের মধ্যে আদর্শের সংগ্রামকে ঐক্যবিরোধী কাজ বলে তারাই শেষ পর্যন্ত ঐক্য নষ্ট করে। আদর্শের রফা হয় না ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য — এ হতে পারে না। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দোহাই দিয়ে আদর্শ কমপ্রোমাইজ করলে সে ঐক্য থাকে না। সে ঐক্যের একটিই মানে — আদর্শ বিসর্জন দিয়ে কোনও একজনের পদলেহন করা। তা না হলে, ঐক্যের মধ্যে যে সংগ্রাম রয়েছে, সেটিকে জনতার সামনে তুলে ধরতে হবে। সেটিকে তুলে ধরে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত উদ্যোগ নিয়ে আর স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনাদের গণসংযোগ বাড়িয়ে যেতে হবে, পিপ্‌লস ইনস্ট্রুমেন্ট অব স্ট্রাগ্‌ল, জনতার নিজস্ব লড়াইয়ের হাতিয়ার গড়ে তুলতে হবে, আর তারই মধ্য দিয়ে পিপ্‌লস পলিটিক্যাল পাওয়ার, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। এ যদি করে যেতে পারেন তবে বিপ্লব একদিন আসবেই, ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম কেউই ঠেকাতে পারবে না, আপনাদের ইনকিলাবের স্বপ্ন একদিন সফল হবেই।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

১৯৭৪ সালের ১৮ মার্চ, দুর্গাপুর
ইস্পাত নগরীতে, দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কার্স
কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রথম বার্ষিক
সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৭৬ সালের ৭ নভেম্বর ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী
কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।